Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 521–528
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বাংলাদেশের নকশি কাঁথা : চিত্র ও মোটিফের পর্যালোচনা

মো. তরিকত ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : tarikat1974@ku.ac.bd

Keyword
Nakshi Kantha, Motifs, Values, Beliefs

Abstract
Nakshi Kantha is the most traditional and important domestic needle-craft art of women in Bangladesh that displays the multiracial and multi-religious expressions of motifs. These motifs indicate the desire for self-expression as well as the demonstration of the artisan's objectives. Nakshi Kantha is not only a decorative quilt but also the canvas for self-expression, values, and beliefs of rural women of Bangladesh. They produce the art in recycling depleted materials like sharees, lungis, and dhutis are stitched to form embroidery quilts for their necessary purpose in a particular use. Though it is a very old traditional artistic element of material art but for its unique design and elegance, it is a fascination to the people of Bangladesh and West Bengal of India till contemporary period. Various type of Nakshi Kantha in style, form, fabric or technique has been found in different places of Bangladesh and every region has its own style. This article is an attempt to study and understanding of several types of Nakshi Kantha of Bangladesh.

Discussion

ভূমিকা : বাংলাদেশের লোকশিল্পের অন্যতম নিদর্শন হল নকশি কাঁথা। গ্রামের অতিসাধারণ মেয়েরা এ কাঁথা তৈরি করে থাকে। দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কাঁথার ব্যবহার আছে। গ্রামের মেয়েরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সূ[2]ভাবে সুঁচের মাধ্যমে চিত্র ও মোটিফের দ্বারা নকশি কাঁথা তৈরি করে বিশ্বশিল্পের এক অনবদ্য নিদর্শনরূপে উপস্থাপন করেছে।

নকশি কাঁথার চল মূলত বাংলাদেশে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে নকশি কাঁথা তৈরির চল না থাকলেও একসময় সেখানে কাঁথা তৈরির বেশ চল ছিল। আইসিএস গুরুসদয় দত্ত উনিশ শতকে বাংলাদেশ থেকে যে কাঁথাগুলো সংগ্রহ করেছিলেন এবং নকশি কাঁথা শিল্পীদের যে নাম উদ্ধার সম্ভব হয়েছিল, তারা বেশিরভাগই হিন্দু সম্প্রদায়ের। [১]
নকশি কাঁথার বাজার চাহিদা আর দারিদ্র্যের কারণে নারী শিল্পীরা সংগঠিত হয়ে নকশি কাঁথা বিক্রির জন্য ঝুকতে থাকে। এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের ফরিদপুরের 'কামার গ্রাম মহিলা সমিতি' বা কলকাতার-৩ এর হগ স্ট্রিট এর 'হোম ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশান' এর নাম উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত শব্দ 'কন্থা', প্রাকৃত শব্দ 'কত্থথা' থেকে বাংলা 'কাঁথা' শব্দের উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়। বাংলার কাঁথা সম্মন্ধে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-এ, যা আনুমানিক ৫০০ বছর আগে রচিত, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে শ্রী চৈতন্যের মাতা তাঁর নিকট একটি কাঁথা পাঠিয়েছিলেন।[২] ঠিক কখন সাধারণ ব্যবহার উপযোগী কাঁথা নকশি কাঁথার স্তরে উত্তীর্ণ হয় তা লিপিবদ্ধ নাই। ব্যবহৃত উপকরণের প্রকৃতি এবং বাংলার জলবায়ূর কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় কাঁথা দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যায়। বাংলার নকশি কাঁথার সর্বপ্রাচীন উদাহরণগুলি সেহেতু দেশি নয়, এগুলি ষোলশত শতাব্দির ব্যাঙ্গালা বা সাতগঞ্জ কাঁথা যেগুলি পর্তুগিজদের নির্দেশে তৈরি করা হয়। ... ইংরেজি বাণিজ্যিক দলিলে বাংলার নকশি কাঁথার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারির ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট কার্যবিবরণীতে।[৩]

কাঁথার প্রতি আগ্রহ দেখা যায় ২০ শতকের প্রারম্ভিক দশকসমূহে যখন স্টেলা ক্রামরিশ, গুরুসদয় দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন এবং জসীমউদ্দীন এ শিল্প পুনরুদ্ধার করেন। স্টেলা ক্রামরিশ কাঁথার বিষয়ে লেখেন এবং অনেক কাঁথা সংগ্রহ করেন। যেগুলি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার মিউজিয়াম অব আর্টে রক্ষিত আছে। গুরুসদয় দত্ত কাঁথার উপরে লিখেছেন এবং তাঁর সংগ্রহ পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরপুকুরের গুরুসদয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে। জসীমউদদীন দীনেশচন্দ্র সেনের জন্য কাঁথা সংগ্রহ করেন, যিনি শুধু কাঁথার উপরে লিখেই ক্ষান্ত হন নাই বরং একধিক কাঁথা সংমিশ্রণে নকশা তৈরি করানোর প্রায়শও পেয়েছেন। জসীমউদদীন ইতিমধ্যে অণুপ্রাণীত হয়েছিলেন নকশি কাঁথার উপরে কবিতা লিখতে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রণাথ ঠাকুর বাঙালি সংস্কৃতির দেশীয় মূল অনুসন্ধানের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। এ পরিবেশে কাঁথাসহ স্থানীয় শিল্পকলা লালন-পালন করা হয়েছিল।[৪]

নকশি কাঁথার প্রকারভেদ :

যশোরের কাঁথা শ্রেষ্ঠতম হলেও রাজশাহীর কাঁথাও ব্যাতিক্রমধর্মী। রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আসে সবচেয়ে পুরু কাঁথা, যার মধ্যে শাড়ির পাড়ের সূতোর পরিবর্তে সাধারণ সূতো দিয়ে সম্পূর্ণটাই নকশা করা লহরী কাঁথা। এছাড়া লালসালু দিয়ে তৈরি সুজনী কাঁথাও উল্লেখযোগ্য। যশোরের কাঁথার ফোঁড় অত্যন্ত সূক্ষ্ম, রঙ অনুজ্জ্বল। ফরিদপুরের কাঁথা যশোরের অনুরূপ হলেও ফোঁড় তত সূক্ষ্ম নয়, রঙও একটু বেশি। খুলনার কাঁথা ফরিদপুরের মতো রঙ চঙা বেশি।

ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের কাঁথা যশোরের মতো হলেও তাতে সূক্ষ্ম, ফোঁড় নেই।

কুষ্টিয়ার কাঁথা যশোরের মতো হলেও রাজশাহীর কিছু প্রভাব লক্ষ করা যায়। রংপুর, জামালপুর ও পাবনার মোটিফেসন কম। এবং চট্টগ্রামেরঁ কাঁথার ফোঁড় সূক্ষ্ম নয়, তবে জ্যমিতিক ছক ফুল লতাপাতায় চিত্রিত। বাংলাদেশে নানান ধরনের নকশি কাঁথার নিদর্শন দেখা যায়। যেমন সুজনী কাঁথা, লেপ কাঁথা, চাদর কাঁথা, আসন কাঁথা, দস্তরখান, পালকির কাঁথা, শিশুর কাঁথা, রুমাল কাঁথা, আরশিলতা, গিলাফ, বোস্কা প্রভৃতি। বাংলাদেশের নকশি কাঁথা সেলাইয়ের দুটি মূলধারা, তার একটি হলো যশোর অপরটি রাজশাহী।

অলংকরণের তারতম্য অনুসারে যশোর রীতির কাঁথাকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা : চিত্রিত কাঁথা, মটিফ কাঁথা ও পাইড় কাঁথা। চিত্রিত কাঁথায় বিয়ে-শাদী, নাচ-গানের অনুষ্ঠানের ছবি সূচের ফোঁড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। মটিফ কাঁথায় জীবনবৃক্ষ, পদ্ম, চাঁদ, তারা, মাছ, হাতি, আয়না, চিরুনী প্রভৃতি মটিফ বা মুদ্রা অঙ্কিত হয়। পাইড় কাঁথায় সূচ সূতা দিয়ে শাড়ির পাইড়ের মতো লম্বালম্বিভাবে পাইড় তোলা হয়।

... ধান শিষ, বাদুড় চাড়া (বাদুরের নখ), জোড়া কাঁকড়া, পিঁপড়ার সার, কাঁচি ধার, তাবিচ পাড়, নয় চিড়ে, শ্যামলতা, মইপাড়, কাজললতা, মোহনমালা, মাদারকাঁটা, তেরসীলতা, হরিতকি, খেঁজুরছড়ি, করলাবিচি প্রভৃতি নামের পাড়সম্বলিত কাঁথা সেলাই করা হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।[৫]

মোটিফ :

কাঁথার চিত্রবস্তু ও প্রধান আকর্ষণ মটিফসমূহ। বটুয়া, আরশিলতা, বস্তানী প্রভৃতি ছোট আকারের কাঁথায় মটিফের সংখ্যা কম, কিন্তু লেপকাঁথা, আসনকাঁথা ইত্যাদির মটিফে বাহুল্য ও বৈচিত্র্য আছে। কাঁথার মটিফের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পদ্ম, সূর্য, চক্র, কলকা, ফুল, লতাপাতা, জীবন-বৃক্ষ, পশুপাখি, জ্যামিতিক রেখা, সংসারজীবনে ব্যবহার্য নানা দ্রব্য ইত্যাদি। কতক মটিফের স্থান নির্ধারিত আছে, যেমন পদ্ম ও সূর্য থাকে সাধারণত কাঁথার মধ্যস্থলে, কলকা ও সজিব গাছ চার কোণায়, আর তরঙ্গিত পুষ্পিত লতা থাকে বর্ডারে; অন্যগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।[৬] কাঁথাতে সাধারণত মাছ, পাতা, ধানের ছড়, চন্দ্র, তারা, ঘোড়া, হাতি, দেবদেবীর ছবি অথবা কোনও গ্রাম্য ঘটনার ছবি বুনট করা হয়।[৭] দীনেশচন্দ্র সেন নকশি কাঁথার চিত্রের মধ্যে পদ্ম, ধানের শিষ, পাতা, ফুল প্রভৃতি নিত্যপরিচিত বস্তু ছাড়াও রাজা, প্রজা, রথ, হস্তী, অশ্ব, পৌরাণিক উপাখ্যান প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।[৮]

কাঁথা বিষয়ক বেশিরভাগ লেখক মোটিফ এবং আত্মিক সাদৃশ্যের জন্য কাঁথা এবং আলপনার মধ্যে যোগসূত্রের নির্দেশ করেন। উদাহরণস্বরূপ, সেঁজুতি ব্রতে আলপনা অঙ্কন করা হয় বৃত্ত বা মণ্ডলের মাঝখানে পদ্ম দিয়ে। সূর্য, চন্দ্র, গহনা, একটি নৌকা, একটি পালকি মোটিফ হিসেবে যুক্ত হয়। অন্যান্য আলপনায় অঙ্কন করা হয় পশু, গাছ, পদচিহ্ন এবং ভক্তের নিজের অথবা যার জন্য ব্রত পালন করা হচ্ছে তার আকাঙ্ক্ষার বস্তু।[৯]

অন্যান্য বহুল ব্যবহৃত মোটিফে উপস্থাপিত হচ্ছে নারীর হৃদয়। ময়ূর যদিও বাংলার দেশীয় পাখি নয় তবুও তা কাঁথা শিল্পের একটি জনপ্রিয় মোটিফ। ময়ূর সাধারণত দেবতা কার্তিকের প্রতীক। (জসীমউদদীন, নকশি কাঁথার মাঠ)। কিন্তু ভারতীয় চিত্রের প্রায়শই ময়ূর অনুপস্থিত প্রেমিকের সাথে সম্পর্কিত। এজন্য বলা যায় যে, ময়ূরের জনপ্রিয়তা হয়তো নারীর কামনার সাথে সম্পৃক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দির ফরিদপুরের একটি কাঁথায় দুটি নারী মূর্তি আছে, যা দু'জনই ময়ূর আলিঙ্গন রত।

... মাঝখানের মণ্ডলটি কাঁথার সবচেয়ে সর্বব্যাপী মটিফ এবং ঐতিহ্যবাহী কাঁথায় এটা সবসময় পদ্ম। পদ্মটি অষ্টদল অথবা শতদল এবং এর চতুর্দিকে থাকে ঢেউ খেলানো লতা অথবা শাড়ির পাড়ের নকশা। মাঝে মধ্যে পদ্মের সবচেয়ে বাইরের সীমারেখা বৃত্তাকার না হয়ে বর্গাকার হয়, যার কোণাগুলিতে ফুল বা কলকার নকশা করা থাকে। পদ্মের অতীত সন্ধান করে পাওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতায় এবং হিন্দু মূর্তিতত্ত্ব মতে পদ্ম দেবতাদের পীঠস্থান। তবে কাঁথায় পদ্ম মোটিফ উপর থেকে দেখা প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারের। এ খোলামুখী পদ্ম খুবই ঘনিষ্টভাবে লক্ষ্মীদেবীর সাথে সম্পৃক্ত এবং নারীর প্রজনন ক্ষমতার প্রতীক।[১০]

মোটিফ কাঁথার চিত্রে রয়েছে পদ্ম, জীবনবৃক্ষ, চক্র, সোয়াস্তিকা, পানপাতা, ঘর-গৃহস্থালির জিনিসপত্র, হাতি, মাছ প্রভৃতি। দুনিয়া জোড়া লোকশিল্পের কিছু অভিন্ন মটিফ দেখা যায়। এসব মটিফের রহস্য উদঘাটনের জন্য লোকবিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্পবেত্তাদের এক সঙ্গে কাজ করা দরকার।[১১] ধারণা করা হয় কলকা ভারতে এসেছে পারস্য হয়ে, যেখানে এটা সাধারণভাবে একটা পাতার প্রতীক। এটা বিচিত্ররূপে সম্পৃক্ত হয়েছে একটি শিখা, একটি আম, একটি গাছ, ইন ইয়াং প্রতীকের অর্ধেকের সাথে। কলকা কন্দাকার নিম্নাংশ একটি নারীর শরীরের ব্যঞ্জনা করে। কোনও কোনও মোটিফে দেখানো হয়েছে কলকা থেকে অন্যান্য কলকা পল্লবিত, এবং এরূপে এটি আলপনার একটি উর্বরতার প্রতীকের সাথে খুব সাজস্যপূর্ণ। যদি কলকা গাছের প্রতীক হয়ে থাকে তবে এটা নির্দেশ করে জীবনবৃক্ষকে যা ঘনিষ্টভাবে নারীর সাথে সম্পৃক্ত। [১২]

মুসলিম শিল্পীর কাঁথার কেন্দ্রস্থলে গুরুত্ব পেয়েছে গোল পুষ্পচিত্র ও সূর্য। হিন্দু-মুসলিম উভয় শিল্পীরাই কেন্দ্রস্থলে একটি চক্রাকার ভাবনার দিকে জোর দিয়েছেন। চক্র হলো জাগতিক বিন্যাসের প্রতীক। বলাবাহুল্য সূর্য শক্তি আর পদ্ম পবিত্রতার- শান্তি-শুভকামনার প্রতীক। [১৩]

সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত নকশি কাঁথা :

কলকাতার বেশ কয়েকটি বনেদি বাড়ির এবং পশিচমবঙ্গের বেশ কয়েকটি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত কাঁথাগুলি দেখলেই বোঝা যাবে নকশি কাঁথা এক সময়ে কী রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশের সংগ্রহশালাগুলিতে কাঁথার ভিড় চোখে পড়ার মতো। পশ্চিমবঙ্গে সংরক্ষিত হচ্ছে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাঁথা। কলকাতার ঠাকুরপুকুরে গুরুসদয় সংগ্রহশালায় খুলনার মানদাসুন্দরী ঘোষ (বসু) কাঁথা, অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহিত সোনামণি দাস্যার কথা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে মাগুরার বামাসুন্দরী দাস্যার কাঁথা, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে আছে শিলাইদহে উপহার পাওয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত কাঁথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামসহ শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় বাংলাদেশের নকশি কাঁথা রয়েছে।

সংগ্রহশালায় সংগৃহিত, সংরক্ষিত নকশি কাঁথাগুলোর কোনোটিই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের নয়। উনিশ শতকে স্টেলা ক্রামরিশ একটি নকশি কাঁথাকে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের বলে চিহ্নিত করেছেন। গুরুসদয় দত্ত সংগৃহিত নকশি কাঁথাসহ হস্তশিল্পের কিছু নমুনা ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ কলকাতার 'দ্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' ভবনে প্রদর্শিত হয়েছিল।[১৪] ১৯ শতক ও ২০ শতকের মোট ২১০টি নকশি কাঁথাগুলো সংরক্ষিত আছে গুরুসদয় সংগ্রহশালায়। এর মধ্যে গুরুসদয়ে সংগৃহিত ২০১ টি। লোকসংস্কৃতি, গবেষক, শিল্পী মহলে মনসাসুন্দরীর কাঁথা নামে যে নকশি কাঁথাটি বহু প্রশংসিত, সেই কাঁথাটি গুরুসদয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত এবং সংগ্রাহক গুরুসদয় দত্ত। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার, বর্তমান বাংলাদেশের খুলনার মূলঘর থেকে আনুমানিক ১৯ শতকের এই নকশি কাঁথাটি সংগৃহিত। পূর্বে ব্যবহৃত শাড়ি, ধুতি এবং কাপড়ের পাড় থেকে ছড়ানো কিছু রঙিন সূতো যে কতটা ব্যঞ্জনাত্মক হয়ে উঠতে পারে, তা এ কাঁথাটি না দেখলে বোঝা যাবে না।

মুসলিম পরিবারের কাঁথা তৈরির চল আছে ঠিকই কিন্তু হিন্দু পরিবারের কাঁথাগুলো বেশি আকর্ষনীয়। মুসলিম কারিগরেরা মূলত স্বল্প আকৃতির স্থাপত্য নির্ভর বিদ্যায় গুরুত্ব দিয়েছেন। কিছু বাধা-নিষেধ থাকায় চিত্রের বিষয় সংক্ষিপ্ত। সরাসরি বাস্তবধর্মী প্রবণতাকে এড়িয়ে গিয়ে প্রাকৃতিক বিষয়গুলিকে অলংকরণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো একটি বিষয়ের গুরুত্ব হ্রাস করতে আরও কয়েকটি বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। চাঁদ-তারা, আঙ্গুললতা, বড় আকৃতির ফুল, তরবারি, মসজিদ, কাজললতা, আয়না, চিরুনি, লতাপাতা, পাখি এরকম কিছু বিষয় মুসলিম কাঁথায় বিষয় বৈচিত্র্যের আলো হিসেবে দেখা দিয়েছে। আর কেন্দ্রস্থলে গোল পুষ্পচিত্র বা সূর্য গুরুত্ব পেয়েছে মুসলিম কাঁথায়।

হিন্দু রমনীদের কাঁথায় সাবলিলভাবে ফুটে উঠেছে শিল্পীর জীবন তরঙ্গ। দৈনন্দিন জীবনের সাথে যা কিছু জড়িয়ে তাই সহজ-সরল ভঙ্গি নিয়ে অলংকরণের বিষয় হয়ে উঠেছে। কেন্দ্র বিন্দুতে গুরুত্ব পেয়েছে প্রস্ফুটিত পদ্ম। পদ্ম দেব-দেবীর আসন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পবিত্রতা-শান্তি-শুভকামনার প্রতীক। কাঁথায় ফুল আর তার উপর মৌমাছির চেনা দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। ফুল ভালোবাসারই আরেক রূপ এবং কামনার প্রতীকও বটে। সাংকেতিক বিচারে চক্র হলো জাগতিক বিন্যাসের প্রতীক, প্রজাপতি মিলনের প্রতীক, মাছ গোষ্ঠীকেন্দিক মানসিকতায় প্রজননের প্রতীক। দেবতাদের শক্তিমত্তার শ্রেষ্ঠ উপমা হিসেবে বৃষ। জীবনের প্রতীক বৃক্ষ বা কল্পবৃক্ষ শুভ্রতা ও পবিত্রতার চিহ্ন হিসেবে শঙ্খলতা গুরুত্ব পেয়েছে। ছবিতে মনসাসুন্দরীর কাঁথা।

প্রথমত মনসাসুন্দরীর কাঁথাটি জমিদারবাড়ির উৎসর্গ লিপি থেকে যা স্পষ্ট, আর দ্বিতীয়ত এটি দোরোখা সুজনি কাঁথা। গুরুসদয় দত্ত নকশি কাঁথার যে শ্রেণিভাগ করেছিলেন সেখানে সুজনি কাঁথা মূলত অতিথি বা প্রিয়জনের সম্মান রক্ষার্থে অথবা উৎসব অনুষ্ঠানে বিছানার চাদর হিসেবে ব্যবহৃত। কষ্টসাধ্য ও দক্ষতার সঙ্গে তৈরি এ কাঁথাটি

চারিত্রিক গুণে দু'দিক এক তাই 'দোরোখা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। একমাত্র উৎসর্গ লিপিটিই স্বাভাবিকভাবে উল্টো হয়েছে। বাংলা অক্ষরে লেখা 'এই সজনী দঙ্গল বাঁধাল নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসুর কন্যা 'আমি শ্রীমতি মানদাসুন্দরী দাস্যা মোমহস্তে প্রস্তুত পূর্বক শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়কে এই সজনী প্রণাম পূর্বক দিলাম। সভ্যগণ মহাশয়েরা যেত্রীটি হয় মাপ করিবেন।' এইমতেই ধরে নেওয়া হয় বাল্যবিধবা মানদাসুন্দরী দীর্ঘদিন ধরে এ কাঁথাটিকে সাজিয়ে তুলেছেন। কোম্পানীর ছাপাই ছবি এবং কালীঘাট পট তাকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে এমন ইঙ্গিত মেলে সূতোর বাঁধনে আঁকা টুকরো টুকরো তৎকালীন সামাজিক দৃশ্যগুলিতে। কিংবা জমিদার কন্যা হিসেবে তার সুযোগ হয়েছিল কলকাতার জমিদারবাবুদের দেখা। কাঁথাটিতে ঘটেছে সামাজিক কাল্পনিক দৃশ্য এবং জীবজগৎ আধ্যাত্মিকজগৎ এর সংমিশ্রণ।



এ নকশি কাঁথাটির শিল্পী মানদাসুন্দরী দাস্যা। ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি পরিমাপের কাথাটির মধ্যস্থলে প্রস্ফুটিত শতদল পদ্ম। পদ্মের চারিদিকে বৃত্তাকারে চোখ ধাঁধানো শৃঙ্খলিত কলকা, জ্যামিতিক নকশা-শিউলী চাক্তি। কাঁথাটির দুই বিপরীত মুখে একদিকে সারিবদ্ধ গোরা-পল্টন, কিংবা হতে পারে পতুর্গিজ সেনা ঠিক তার বিপরীত দিকে ইংরেজ অধীন ভারতীয় সৈন্যদল। ঝুঁটি-টুপি ও তেলকোট পরা বিদেশিদের হাতে তরবারি আর পকরি টুপি পরা ভারতীয় সেনাদের হাতে বন্দুক। এ বন্দুকই মনে করিয়ে দেয় সিপাহী বিদ্রোহ। ভারতীয় সেনাকে শুধু পোশাকের গুণে আলাদা করা হয়নি, চোখমুখ পর্যন্ত আলাদা। একদিকে অন্দরমহল, ঠিক তার বিপরীতে বারমহল। জমিদার বাড়ির অন্দরমহলে একান্নবর্তী পরিবারের ছাপ। মধ্যবয়স্ক মহিলা একে অপরকে স্পর্শ করে মাঙ্গলিক কাজে ব্যস্ত। আর অল্পবয়স্ক মহিলারা সাজপোশাকে ব্যস্ত। যেখানে দেখা যাচ্ছেÑ কোনো একটি মেয়ে ঘোমটা পোশাক নিয়ে ব্যস্ত।

অন্দরমহলে বহিরাগত পুরুষ প্রবেশ নিষিদ্ধ। একমাত্র কুলপুরোহীত, সাধু, সন্ন্যাসী, জ্যোতিষীরা প্রবেশ করতে পারতেন, তাই অন্দরমহলে পুরুষ হিসেবে তাদেরই দেখা যাচ্ছে, তাদের বেশভূষায় এটি স্পষ্ট। আর অন্যদিকে বারমহলে দাঁড়পাল, নর্তকীর নৃত্য, নর্তকীদের সাজঘর, চেয়ারে বসে নেশাগ্রস্থ জমিদার, মদ হাতে মহিলার যাতায়াত, আছে হনুমান সাজে বহুরূপীও। আয়তকার কাঁথাটির চারকোণে পদ্মের অংশ এবং ডালপালাসহ গুচ্ছ কদমফুল। এছাড়া আছে জমিদার বাড়ির দরজা-জানালা এবং মেয়েদের জানালা দিয়ে উন্মুখ চিত্তে তাকিয়ে থেকে বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা। পাশাপশি আছে কোনও এক মহিলার সঙ্গে পুরুষ চরিত্রের বাইরে যাওয়ার অনুমতি। আগে কুকুরের গলায় চেন পরিয়ে বাবুদের ঘুরতে যাওয়ার দৃশ্য বা রথের ভেতরে বেগম এবং বাইরে নবাব; এক প্রকার ঘুরতে যাওয়ার দৃশ্য, হাতির পিঠে চড়ে ভারতীয় মাহুত এবং দুই সাহেব। হাতির পিঠে বিছানার চাদরটিও নকশাখচিত। আছে সাধুর যোগসাধনা এবং ধুনো-ধোঁয়ার পুঞ্জ এবং ঐরাবত ভারধারণ করার ক্ষমতা দৈবশক্তি বলে সম্ভব। আছে চূড়ায় পতাকা লাগানো রথ। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো আছে কিট-পতঙ্গ ও পশু-পাখি, প্রজাপতি, মৌমাছি, বোলতা, টিকটিকি, গোসাপ,

কুমির, রুই, কাতলা, কইমাছ, বাগদাচিংড়ি, বক, মাছরাঙা, বুলবুলি, ময়ূর, টিয়া, মুরগি, হাঁস, শেয়াল, শুকর, ছাগলছানা, কাঠপিঁপড়ে, কাঠপোকা, মাকড়সা, কেঁচো-কেন্নো, সাপ, নেউলের সর্প শিকার। আছে সামনে-পিছনের দিক একদিকে রেখে দু'আনার কয়েন।

বলাবাহুল্য এ চিত্র অংশগুলি বাদ দিলে সারা কাঁথা জুড়ে রয়েছে গুড়িসেলাই। চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলতে সেলাই এর অখণ্ড দক্ষতার যে প্রকাশ তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা ছাড়া উপায় নেই। কাঁথার গা সমতল, উল্টোপিঠে রেখার টানের ফারাক নেই কিন্তু ভরাটের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। উল্টোপিঠের ভরাটটি তুলনামূলক অনেক হালকা কিন্তু দূর থেকে দেখলে ছোট ছোট বিন্দু জড়ো হয়ে জমাট হয়ে যায়। ছিল কালো, হলুদ, সবুজ, নীল সূতোর ব্যবহার। ছিল লাল সূতোর ব্যবহারও।

হিন্দু সংস্কারে সিঁথির সিঁদুরের সঙ্গে মাঙ্গলিক যোগ থাকায় মানদাসুন্দরী তার অঙ্কিত ভারতীয় পুরুষদের কপালে জয়ের টিকা পরালেও তার অঙ্কিত একটি মহিলারও সিঁথির সিঁথিতে সিঁদুর ঠেকাননি, হয়তো নিজে বিধবা বলে তার ভালবাসার একটি চরিত্রকেও অমঙ্গলের দিকে ঠেলে দিতে চাননি। শিল্পী সবকিছুকে ধরতে গিয়ে যেন নিজেও ধরা দিলেন। সাধক মনের ভালবাসা থেকেই এমন কাঁথা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

আশুতোষ মিউজিয়ামে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক নকশি কাঁথা ও আরশিলতা, বটুয়া সংরক্ষিত রয়েছে। বিশেষ করে যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, নড়াইল, বরিশাল, ঢাকা অঞ্চলের নকশি কাঁথা প্রদর্শিত হচ্ছে। সরজমিনে দেখা গেছে- খুলনার চিত্রায়িত নকশি কাঁথায় নানান চিত্রের বিন্যাস। যেমন অশ্বারোহীর হাতে তীর, ধনুক, বাঘের আক্রমণ নিচে মানুষ, মাছসহ নানান চিত্র- যেন খুলনা অঞ্চলের জনজীবনের প্রতিচ্ছবি। অন্য একটি কাঁথায় তরবারি হাতে মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যশোরের কাঁথার মধ্যে নানান চিত্র ও মোটিফের উপস্থাপনা দেখা যায়। হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, মানুষ, কলকা প্রভৃতি। তবে এ অঞ্চলের নকশি কাঁথায় কলকার পরিমান বেশি এবং মাঝখানে বৃত্তাকার নকশার উপস্থিতি দেখা যায়। এছাড়া এখানে ফরিদপুর, বরিশালের আরশিলতা, বটুয়া রয়েছে।

নওগাঁ অঞ্চলের নকশি কাঁথা :

নওগাঁ অঞ্চলে বড় সাইজের নকশিকাঁথাকে আঞ্চলিক ভাষায় পাড়নের কাঁথা বলে। এই কাঁথা গুলি বিছানায় বিছিয়ে রাখা হয়, তবে গায়ে দেবার জন্যেও এ কাঁথা ব্যবহৃত হয়।



এই নকশি কাঁথাটি তৈরি করেছেন সুজাতা দেবনাথ, স্বামী- নয়ন দেবনাথ, থানা- সাপাহার, জেলা- নওগাঁ।

অন্যান্য মোটিফ কাঁথার চেয়ে এখানে পাড়কাথা-ই বেশি তৈরি হয়। এই কাঁথা গুলি বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন- লতা বাহার, ধান শীষা, বিস্কিট বাহার ইত্যাদি। এই কাঁথা ছাড়াও বালিশ কাঁথা ও আসন কাঁথা নওগাঁ অঞ্চলে তৈরি হয়।



ছবির এই নকশি কাঁথাটি তৈরি করেছেন সান্তনা রাণী মন্ডল, স্বামী- জিতেন্দ্র নাথ মন্ডল, থানা- বদলগাছি, জেলা- নওগাঁ।

উপসংহার :

আজকাল শহরের কারু বিপনিতে নকশি কাঁথা বেচাকেনা হতে দেখা যায়। এমনকি বৈদেশিক বাজারেও আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পের বিপণন হয়ে থাকে। গায়ের মেয়েরা সাবেকি কায়দায় ও নকশায় কাঁথা সেলাই করে তা বাইরে বিক্রি করলে তাতে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু নকশি কাঁথার নিজস্ব ধারাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এসব শহুরে সম্ভ্রান্ত দোকানে কৃত্রিমতা আননয়ন করা হচ্ছে। কাঁথায় ছবি এঁকে দিচ্ছে পুরুষ নকশাবিদ, মেয়েরা তার উপর সূতা দিয়ে কাঁথা সেলাই করছে। অনেক সময় সে ছবি দেশিবিদেশি পরিশীলিত শিল্পের অনুকরণে আঁকা। এমনকি বিদেশি ক্যাটালগ থেকে তার নকশা গৃহিত। শহরে লোকদের সৃষ্ট কৃত্তিমতার ফলে আমাদের শতশত বছরের ঐতিহ্য অচিরে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বিষয়ে সুধিসমাজের সচেতন হওয়া আবশ্যক।

কাঁথা প্রায় হারিয়ে গিয়েছে কিংবা বলা চলে আগের সৌন্দর্য হারিয়েছে। টুকরো সৌন্দর্য নিয়ে এসেছে কাঁথা স্টিচ শাড়ি বা অন্য কিছু। অব্যবহৃত কাপড়গুলি আজ শিল্পী মনের আনন্দ প্রতিভার স্পর্শ থেকে প্রায় বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন। যৌথ পারিবারিরক কাঠামো ভেঙে গিয়েছে, হাড়ির সংখ্যা বেড়েছে, কাজ বেড়েছে এবং একই সঙ্গে মেয়েরা বাইরের কাজেও ব্যস্ত হয়েছে। বাজারে এসে গেছে কাঁথার বিকল্প লেপ-কম্বল, ছাপা চাদর, পশমী কাপড়। নকশি কাঁথার চাহিদা থাকলেও সেই মানের শিল্পী কম। বর্তমাণে নকশি কাঁথার শিল্পীদের মধ্যে হারিয়ে গেছে কল্পনা শক্তির স্বতঃস্ফুর্ততা বা সৃষ্টির উন্মাদনা। যার ফলে দক্ষতার বড় অভাব দেখা দিয়েছে এসেছে কৃত্রিমতা। কিন্তু মানুষ এ শিল্পকেই নির্দিষ্ট করে বললে এ শিল্পের সৌন্দর্যকে ফিরে পেতে চাইছে।

তথ্যসূত্র :

১. চূড়ামনি হাটি, নকশি কাঁথা নানারূপে : পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০১৭, পৃ. ১২৮
২. Mohanty, Manjary, `Quilt (Kantha) Art of Bengal

৩. জামান, নিয়াজ, নকশি কাঁথা : চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৫৪৭
৪. জামান, নিয়াজ, নকশি কাঁথা : চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৫৫৪
৫. আহমদ, তোফায়েল, লোকশিল্প, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫৯-৬০
৬. আহমদ, ওয়াকিল, লোকসংস্কৃতি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৭৯-১৮০
৭. জসীমউদদীন, মাসিক মোহম্মদী, বৈশাখ ১৩৫৮, 'পূর্ববঙ্গের নকসী কাঁথা ও শাড়ি' পৃষ্ঠা-৩৮০
৮. সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎবঙ্গ, পৃষ্ঠা-৪৩-৩১
৯. জামান, নিয়াজ, চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৫৫০
১০. Ahmed, Perveen, The Aesthetics and Vocabulary of Nakshi Kantha : Bangladesh National Museum Collection (Dhaka 1997
১১. আহমদ, তোফায়েল, লোকশিল্প, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৬১
১২. জামান, নিয়াজ, নকশি কাঁথা : চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৫৫০
১৩. চূড়ামনি হাটি, নকশি কাঁথা নানারূপে : পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০১৭, পৃ. ১৩০
১৪. চূড়ামনি হাটি, নকশা গাথা কাঁথার পিঠ, শিলাদিত্য, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ১৩